স্বামীজীর 'পেসন'

প্রব্রাজিকা বিদ্যাত্মপ্রাণা

''স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥''

সর্বকালের সকল সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেছেন। সাধারণ মানুষ কী কী লক্ষণ দেখে স্থিতপ্রজ্ঞকে চিনে নেবেন, এই ছিল অর্জুনের প্রশ্ন। উত্তরে শ্রীভগবান বিষয়-অনাসক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর ধীর, স্থির, আনন্দময় অবস্থা বর্ণনা করেছেন। গীতার এই বর্ণনার থেকেও আরও গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পারস্পরিক ব্যবহার, কারণ এটি সাধারণ লোকদৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপ-বর্ণন নয়, এটি দুজন ব্রহ্মজ্ঞানীর অলৌকিক সম্পর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, এ যেন গাঁজাখোরের সঙ্গে গাঁজাখোরের মিলন, যার প্রতিটি মুহূর্ত ব্রহ্মানন্দের দ্যুতিতে উজ্জ্বল।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করেন বেলঘরিয়ায়, দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানানন্দও মাত্র চোদ্দো বছরের বালক হরিপ্রসন্ন। দেওয়ানজীর বাগানে যখন হরিপ্রসন্ন পৌঁছলেন তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। বাধ্য হয়ে হরিপ্রসন্ন একটি গাছে উঠে বসলেন। বাড়ির ভেতর উঠোনে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সমাধিমগ্ন, মুখে অপার্থিব হাসি। উঠোনের পাশেই সদর ঘরে এক যুবক ধ্রুপদ গান গাইছেন। এমন গাইছেন যে, তিনজন পাখোয়াজ বাজিয়েও তাল দিতে পারছেন না। শেষে একজন বললেন, ''ধন্যি ছেলে বাবা! একলাই তিনজনকে নাকাল করলে! কালে তুমি মস্ত কিছু হবে।''[১] হরিপ্রসন্ন পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ, বাড়ি সিমলায়। পরিচয় জানলেও ছাত্রজীবনে হরিপ্রসন্নের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের আর দেখা হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াতের সময় তাঁর মুখে হরিপ্রসন্ন নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে থাকতে পারেন।

ছাত্রজীবন শেষ করে হরিপ্রসন্ন তখন ইঞ্জিনিয়ার, উত্তরপ্রদেশে কর্মরত। সেসময় স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজন করতে করতে উত্তরপ্রদেশের এটাওয়াতে বিপ্রদাস বিশ্বাসের বাড়িতে ও গাজিপুরে মুনসেফ শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই দুই জায়গাতেই দুই গুরুভ্রাতার সাক্ষাৎ হয়।[২] চাকুরিরত অবস্থাতেই কোনও সময় হরিপ্রসন্ন জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার কাছে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা ব্যক্ত

করেন : ''আমার চাকরির সময় স্বামীজীকে সাধু হবার কথা বলি। তখন মঠের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাতাম। স্বামীজী বললেন, এখন মঠে যোগ দিলে টাকার অভাবে কষ্ট হবে মঠের সকলের। যখন অবস্থা ভাল হবে জানাব।"[৩]

স্বামীজীর মতো হরিপ্রসন্নও ছিলেন পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ছোটবেলায় তাঁরও পিতার অকাল মৃত্যু হয়। তাই সাংসারিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কিছুকাল চাকরি করতে বাধ্য হন। খুব সম্ভবত, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে হরিপ্রসন্ন সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। এর কয়েক মাস পরে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। ওই বছরই ২০ জুন আলমোড়া থেকে ভগিনী নিবেদিতাকে (তখন মিস মার্গারেট নোবল) লেখা চিঠিতে স্বামীজী নবাগত ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্নের উল্লেখ করেছেন : ''[আলমবাজার মঠে] জনাকয়েক ছেলে ইতোমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে;... যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (Executive Engineer) ছিল। ভারতের এটি একটি উচ্চ পদ। সে খড়কুটোর মতো ঐ পদ ত্যাগ করেছে।"[৪]

হরিপ্রসন্নের ওপর স্বামীজী আস্থা রাখতেন, তাঁর ওপর কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়াররা যখন হিমালয়ের কোলে একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য ব্যস্ত, তখন স্বামীজী শ্রীনগর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখে আলমবাজার মঠ থেকে ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্নকে ডেকে পাঠান। ''ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন যদি আসতে পারে তো বড় ভাল হয়। মিঃ সেভিয়ার একটা স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—যা হয় একটা শীঘ্র করে ফেলতে পারলে হয়। হরিপ্রসন্ন ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, ঝট্ করে একটা করতে পারবে। আর জায়গা-টায়গা সে ব্যক্তি বোঝেও ভাল।"[৫]

দেরাদুন থেকে স্বামীজী যান রাজস্থানে। এই যাত্রাপথের বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী হরিপ্রসন্নের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবী মন্দিরের কোথায় কী হবে এবং কীরকম স্থাপত্য হবে সে-বিষয়ে আলোচনা করতেন। ভ্রমণের মাঝে সময় পেলে স্বামীজী সহযাত্রী সাধু-ব্রহ্মচারীদের সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াতেন। এইভাবে হরিপ্রসন্ন স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের সুযোগ পান—হয়ে ওঠেন স্বামীজীর স্নেহের 'পেসন'। স্বামীজী 'পেসন'-কে কাছে ডেকে কথাবার্তা বললেও 'পেসন' কিন্তু স্বামীজীকে চিরকাল বিশেষ সমীহ করে চলতেন। নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন ও কথাবার্তা সহজে বলতেন না। পরবর্তী কালে বলেছিলেন, ''স্বামীজী কত উঁচুতে থাকতেন। আমার ভয় হতো তাঁর কাছে যেতে। তাঁকে বাপের মত দেখতুম। তিনি ভালবাসায় আমাদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন, তবুও।"[৬] বেলুড় মঠে স্বামীজী যখন ব্রহ্মচারীদের ক্লাস নিতেন, ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন নির্বাক শ্রোতা হিসাবেই ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন। কেবলমাত্র একদিনই তিনি ক্লাসে একটি প্রশ্ন করাতে স্বামীজী বলে উঠলেন, ''পেসন, এখন কিছুদিন হবিষ্যাদি কর। তাহলে এরকম গেঁড়ে-ডোবা (frog-in-the-well) বুদ্ধি হবে না।"[৭] উত্তর শুনে হরিপ্রসন্নের প্রশ্ন করা চিরতরে বন্ধ হল।

স্বামীজীর এই ধরনের বকুনি ছিল নিতান্তই বাহ্যিক। অন্তরে অন্তরে ত্যাগী ইঞ্জিনিয়ার গুরুভাই সম্বন্ধে তাঁর বেশ গর্ববোধ ছিল। পেসনের ওপরেই তিনি বেলুড় মঠের যাবতীয় বাড়ি, ঠাকুরঘর, একটি ঘাট ও গঙ্গার ধারে পোস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শুধু দায়িত্ব দেওয়াই নয়, হরিপ্রসন্নের দায়িত্ব পালনে স্বামীজী এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, ১৮৯৯ সালের জুন মাসে দ্বিতীয়বার

বিদেশযাত্রার আগে তিনি বেলুড় মঠে একটি সভা আহ্বান করেন, পেসনকে তাঁর কাজের জন্য অভিনন্দন জানাবেন বলে।

ঘর-বাড়ি তৈরির কাজে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য প্রায়ই হরিপ্রসন্নকে স্বামীজীর কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেতে হত। কিন্তু তিনি সেসব নির্বিকারচিত্তে হজম করে আনন্দের সঙ্গে কাজ করে যেতেন। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি মজার ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

একদিন স্বামীজী বললেন, ''মঠে জলের বড় কষ্ট। ঘাটটা বেঁধে ফেল পেসন্।... চাঁদা তোল্। মঠের সাধুদের সবাইকে চাঁদা দিতে বল্। ভিক্ষে করে উঠবে চাঁদা। আমি আড়াই শ' টাকা দেব।" সাধুরা সবাই যে যার সামর্থ্যমতো টাকা সংগ্রহ করলেন। কেবল স্বামীজীর টাকা বাকি। হরিপ্রসন্ন স্বামীজীকে আড়াইশো টাকা দেওয়ার কথা মনে করানো মাত্র স্বামীজী রেগে গেলেন, বললেন, ''দেব বললেই দিতে হবে—এমন কি কথা আছে?"[৮] তবে কি আমরা মনে করব, স্বামীজী এক্ষেত্রে সত্যকে ধরে থাকেননি? স্বামীজীর এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তী কালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলেছিলেন, ''তখন স্বামীজী অতি উচ্চ ভাবে ডুবে থাকতেন সর্বদা। অন্য কথা হলেই তীব্র যাতনা অনুভব করতেন। আবার যখন মন নীচে থাকতো তখন ছেলেমানুষের মতো হয়ে যেতেন। আঁট নেই—পরমহংস অবস্থা।"[৯]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর বকুনির হাত থেকে হরিপ্রসন্নকে আগলে আগলে রাখতেন। হরিপ্রসন্নের কাছে স্বামীজী 'গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড মার্তণ্ড', আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাজা মহারাজ 'শরৎকালীন moon'।[১০] একবার পোস্তা ও সিঁড়ি বাঁধানোর জন্য বিজ্ঞানানন্দজী যে-খসড়া হিসাব বা estimate দিয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি খরচ হওয়ায় স্বামীজী রাজা মহারাজকে খুবই তিরস্কার করেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজীকে ভক্তরা পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''মহারাজ, আপনি এর আগে তো কতই এমন ব্যয়ের খসড়া হিসেব করেছেন, তবে এরকম ভুল হিসেব করলেন কেন?" উত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বলেন, ''জান কি ভাই, স্বামীজীকে ঐ রকম অল্পব্যয়ের খসড়া হিসাব না দেখালে তিনি কি কখনও ঐ কাজে হাত দিতেন?"[১১]

এ-ঘটনার কিছুদিন পরে আবার কোনও কাজের জন্য স্বামীজীর কাছে গালমন্দ খাওয়ার ভয়ে বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীকে কিছু না জানিয়ে একটি চলতি নৌকা ডাকলেন কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে রাজা মহারাজের নিরাপদ আশ্রয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবেন বলে। যখন তিনি নৌকায় উঠতে যাচ্ছেন, স্বামীজী ওপর থেকে দেখতে পেয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, ''পেসন, যেও না, যেও না, তুমি রাজার (মহারাজের) কাছে যেও না—রাজা খুব ভাল লোক নয়।" বিজ্ঞান মহারাজ কিন্তু কোনওদিকে কর্ণপাত না করে সোজা নৌকার ছইয়ের নিচে, স্বামীজীর দৃষ্টির আড়ালে বসে পড়লেন। এমনই ছিল পেসনের সঙ্গে স্বামীজীর বকুনিমধুর সম্পর্ক।[১২]

বেলুড় মঠে গঙ্গার পাকা ঘাট তৈরি হওয়ার সময়ের আর একটি ঘটনা। একদিন খুব রোদ, স্বামীজী মঠের ওপরের বারান্দায় বসে শরবত খাচ্ছেন। নিচে বিজ্ঞান মহারাজ ঘর্মাক্ত শরীরে ঘাটের কাজ তদারকিতে ব্যস্ত—তাঁরও খুব তেষ্টা পেয়েছে। এমন সময়ে স্বামীজীর একজন সেবক এসে একটি গ্লাস তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, স্বামীজী তাঁর জন্য শরবত পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনে বিজ্ঞান মহারাজ খুব খুশি, কিন্তু পরক্ষণেই দেখেন গ্লাসে মাত্র দু-চার ফোঁটা শরবত পড়ে আছে। তাঁর মনে খুবই আঘাত লাগল যে প্রচণ্ড তেষ্টার মধ্যে স্বামীজী এভাবে ঠাট্টা করছেন! যাই হোক, মহাপুরুষের পাঠানো প্রসাদ বলে ওইটুকু শরবতই তিনি খেলেন। কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব তেষ্টা নিমেষে মিটে গিয়ে শরীর জুড়িয়ে গেল। ঘাটের কাজ বন্ধ করে যখন

তিনি ফিরছেন, স্বামীজী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, ''শরবত খেয়েছিলে?'' বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, ''শরবত তো নামমাত্র ছিল কিন্তু যা ছিল তাতেই আমার বেশ তৃপ্তি হয়েছে।'' স্বামীজী একথা শুনে খুব খুশি হলেন।[১৩] প্রসঙ্গত, স্বামী গম্ভীরানন্দজী ভক্তমালিকা গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনার সময় শরবতের পরিবর্তে দুধের উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী তখন চিকিৎসকের বিধি মেনে বরফ দেওয়া ঠান্ডা দুধ পান করতেন।

বেলুড় মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রায় দেড় বছরের কিছু বেশি সময় স্বামীজীর পুণ্যসঙ্গ লাভ করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামীজী তাঁর স্নেহের পেসনের আধ্যাত্মিক জীবনটি সঠিক সুরে বেঁধে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। খুব সম্ভবত ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে হরিপ্রসন্ন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস চেয়ে নিতে বলেছিলেন। সেই বিশেষ দিনটির কথা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পরে বর্ণনা করেছেন : ''আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে তাঁর [ঠাকুরের] কাছে সন্ন্যাস চেয়ে নিলুম। যাবার সময় স্বামীজী কাছে ডেকে নিয়ে ভালভাবে খাওয়ালেন আর বারবার আমার সন্ন্যাস-নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন।''[১৪] উল্লেখ্য, হরিপ্রসন্নকে স্বামীজী নিজে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেননি। তাঁরা নিজেরা যেভাবে ঠাকুরের অবর্তমানে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছিলেন, সেই একইভাবে হরিপ্রসন্নকেও ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস চেয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন।

হরিপ্রসন্ন ছিলেন ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। সেজন্য স্বামীজী যেমন তাঁকে ভালবাসতেন, তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন। স্বামীজী একবার বিজ্ঞান মহারাজের সামনে বলেন, ''আমি পেসনকে বেশী কিছু বলতে পারিনে। আমি যে ওর ভিতর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখতে পাই।'' একথা শুনে বিজ্ঞান মহারাজ সরলভাবে বলে উঠলেন, ''তিনি তো সর্বভূতেই আছেন। আপনার দৃষ্টিতে আপনি আমার ভিতর ঠাকুরকে যে দেখতে পাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?''

''না পেসন্, ঠিক তা নয়। ঠাকুর তোমার আধারে একটু ভালরকম আস্তানা করে নিয়ে বসেছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।''

''আপনি যা দেখছেন দেখুন, আমি তো কই কিছুই বুঝতে পারিনে।''

ঠাকুর যে বিজ্ঞান মহারাজের হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন, একথা তিনি নিজে অনুভব করতে না পারলেও স্বামীজীর কথা শুনে তাঁর খুবই আনন্দ হত।[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে বিশ্বাস করলেও শ্রীমা সারদা দেবীর মহিমা বিজ্ঞান মহারাজ প্রথমে অনুভব করতে পারেননি। তাঁকে তিনি সাধারণ গুরুপত্নীরূপেই দেখতেন। স্বামীজীই প্রথম পেসনের ভুল ধারণা ভাঙিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর কাছে তুলে ধরেন। ঘটনাটি পরবর্তী কালে বিজ্ঞান মহারাজ নিজেই বর্ণনা করেছেন।

''আমি মা-ঠাকরুনের কাছে বেশি যেতাম না। স্বামীজী কি করে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম-মন্দিরে। সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?' আমি বললাম—'না, মশাই।' স্বামীজী বললেন—'এক্ষুনি যাও, মাকে প্রণাম করে এসো।'

তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোনও প্রকারে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন—'সে কি পেসন,—মাকে এই করে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর : মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা!' —বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। আমিও মাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চলে

আসি। আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আমার পেছন পেছন আসবেন।"[১৬]

স্বামীজীকে সমীহ করে চললেও কোনও বিষয়ে মনে সংশয় এলে স্পষ্টবাদী বিজ্ঞানানন্দজী সরলভাবে তা স্বামীজকে জানাতেন, এতে স্বামীজী বিরক্ত হবেন বা রেগে যাবেন মনে হলেও তিনি কিন্তু পেছপা হতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর নির্দেশের কথা স্মরণ করে বিজ্ঞানানন্দজী একদিন স্বামীজীকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা মশায়, আপনি তো পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ তো অন্যরকম ছিল। তিনি বলতেন—'সন্ন্যাসী মেয়েমানুষের পট পর্যন্ত দেখবে না।' আমাকেও তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, 'খবরদার, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশবিনি—হাজার ভক্তিমতী হলেও না।' তাই আমার মনে হচ্ছিল যে আপনি কেন এমনধারা করলেন?" এই কথা শুনে স্বামীজী খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, ''দেখ পেসন, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস ঠাকুর কি অতটুকুই? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস? জানিস, ঠাকুর আমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন? আত্মাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ কি রে? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি কেবল বেছে বেছে পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছিলেন? তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন—স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই।... তিনি তোকে যা বলেছেন তা তো মিথ্যে নয়! সে খুবই সত্যি। তিনি তোকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন তুই ঠিক সেভাবেই চলবি। কিন্তু আমাকে বলেছেন অন্যরূপ। বলেছেন কি রে?—স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি হাত ধরে আমায় যা করাচ্ছেন আমি তা-ই করছি।"[১৭]

একবার আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন, এক হিসাবে বলতে গেলে ভারতের অধঃপতন ঋষি-মুনিদের জন্যই হয়েছে। বিজ্ঞান মহারাজ ভাবলেন, স্বামীজী মুনি-ঋষিদের নিন্দা করছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন—''না মশায়, আপনি ঋষি-মুনিদের সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন।" একথা শুনে স্বামীজীর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। কাছে রাজা মহারাজ পায়চারি করছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বললেন, ''রাজা দেখ, পেসন বলে যে আমি কিছুই জানিনে, বুঝিনে।" রাখাল মহারাজ উত্তর দিলেন, ''তুমিও যেমন! পেসনের কথা কি ধর্তব্যের মধ্যে? ও-তো ছেলেমানুষ, ও কি বোঝে?" অমনি স্বামীজী ঠান্ডা হয়ে গেলেন—একেবারে বালকের মতন।[১৮]

আর একদিন বেলুড় মঠে স্বামীজী বিজ্ঞান মহারাজকে বললেন, ''পেসন, দেশকালের উপযোগী করে নতুন স্মৃতি লিখতে হবে, বুঝলি?" পেসন উত্তর দিলেন—''মশায়, আপনার স্মৃতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?" স্বামীজী শিশুর মতো অভিমানের সুরে রাজা মহারাজকে ডেকে বললেন, ''শোনো, শোনো, পেসন বলে, আমার কথা নাকি দেশ নেবে না।" রাজা-মহারাজ সান্ত্বনার সুরে বললেন, ''পেসন কী জানে? ও ছেলেমানুষ। তোমার কথা দেশ নিশ্চয়ই নেবে।" অমনি স্বামীজীও শিশুর মতো আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ''শুনলি পেসন? দেশ আমার কথা নেবেই।"[১৯]

আপাতদৃষ্টিতে এত মতদ্বৈধ, অথচ মনে গুরুতর কোনও প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর খুঁজতে 'পেসন' স্বামীজীরই দ্বারস্থ হতেন। একদিনের ঘটনা। বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা স্বামীজী, আমরা যে ঠাকুরকে ভোগরাগ দিই, তিনি তা গ্রহণ করেন কি?" স্বামীজী বললেন, ''গ্রহণ করেন বইকি। তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে একটা ray (রশ্মি) ভোগের ওপর পড়ে। তিনি তা গ্রহণ করে আবার পূর্ণ করে দেন। তুই দেখতে চাস তো আজ

ঠাকুরঘরে তোকে দেখাব।" বিজ্ঞান মহারাজ অবশ্য স্বামীজীর কথাতেই বিশ্বাস করে নিলেন, চাক্ষুষ পরীক্ষা করার জন্য আর ঠাকুরঘরে গেলেন না।[২০]

দুই গুরুভাইয়ের অন্তরঙ্গতা তাঁদের দৈনন্দিন সাধারণ আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হত। একদিন বিজ্ঞান মহারাজ মুড়ি খাচ্ছেন। স্বামীজী বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে চট করে একগাল মুড়ি তুলে নিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ চটে গিয়ে বললেন, ''একটা জায়গা করে নিন না? আমার এঁটো খেয়ে আমায় দোষী করেন কেন?" স্বামীজী হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

স্বামীজী জানতেন, বিজ্ঞান মহারাজ নস্যি নিতে ভালবাসেন। একদিন কলকাতা থেকে ফিরে একটি কাগজের মোড়ক তাঁর হাতে দিয়ে স্বামীজী বললেন, ''তোমার জন্য কেমন একটা চমৎকার জিনিস এনেছি।" বিজ্ঞান মহারাজ আগ্রহভরে মোড়ক খুলে দেখেন ভেতরে নস্যি![২১]

হরিপ্রসন্ন স্বামীজীকে রোজ প্রণাম করতেন না। যখন ইচ্ছে হত তখনই প্রণাম করতেন। মঠ যখন নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়িতে, তখন স্বামীজী একদিন হরিপ্রসন্নের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে হল স্বামীজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। যেই পায়ে হাত দিয়েছেন অমনি তাঁর তীব্র শক লাগল। তিনি চমকে উঠে হাত তুলে নিলেন। স্বামীজী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কি রে পেসন্, হলো কি?" পেসন উত্তর দিলেন, ''এ যে মশায় ইলেক্ট্রিক শক্।" স্বামীজী উত্তর করলেন, ''আমেরিকায় সব খরচ হয়ে গেছে রে। ওখানে আরো জ্বলন্ত ছিল।"[২২]

স্বামীজীকে কোনও কারণে গম্ভীর দেখলে বিজ্ঞান মহারাজ কাছে না গিয়ে দূরে দূরে থাকতেন। স্বামীজী ডাকলে বলতেন, ''এখন মশায় কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব।"[২৩] একদিন সন্ধ্যার একটু আগে স্বামীজী বিজ্ঞান মহারাজকে ডেকেছেন। তিনি বললেন, ''এখন ধ্যান করতে যাব।" শুনে স্বামীজী মজা করে বললেন, ''কেমন ধ্যান করবি রে? জল কম পড়বে না ত?"[২৪]*

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।" বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরের উত্তরদিকের ছোট ঘরটিতে থাকার সুবাদে স্বামীজীকে দিনে-রাতে দেখার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল বিজ্ঞান মহারাজের। এক রাতে উঠে তিনি দেখেন, স্বামীজীর ঘর থেকে আলো বেরোচ্ছে। তখন মাঝরাত; বিজ্ঞানানন্দজী ভাবলেন হয়তো পড়াশোনা করার জন্য স্বামীজী আলো জ্বালিয়েছেন। কিন্তু ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন, স্বামীজী গভীর ধ্যানে মগ্ন, তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।[২৫]

রাতে উঠলে পাছে তাঁর পায়ের শব্দে স্বামীজীর

---

* 'জল কম পড়া'-র গল্প : নতুন দীক্ষিত একজনকে গুরু ধ্যান করতে বলেছেন। সে ঠাকুরঘর থেকে একটু পরে বেরিয়ে আসতেই গুরু বললেন, ''সে কিরে! এত শীঘ্র হয়ে গেল! অন্তত এক ঘণ্টা থাকতে হয়।" তখন সে আবার ঠাকুরঘরে গেল, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান করতে পারল না। ঘরেই বসে-দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল। বাইরে আসবার উপায় ছিল না, কারণ গুরু বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেছেন। তার সময় আর কাটে না। তারপর হঠাৎ তার শৌচের বেগ এল, তখন অগত্যা ওই ঘরেই কাজটি সারতে হল। কোশায় জল কম ছিল, সুতরাং সে জলের অভাব অনুভব করল। এক ঘণ্টা পরে গুরু এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, ''কী রে, কেমন ধ্যান করলি?" লোকটি তার নিজের কথাই ভাবছিল, বলল, ''জল কম পড়েছিল।" (দ্রঃ সংকলক : স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ২৬১-৬২)

অসুবিধা হয়, এই ভয়ে তিনি পা টিপে টিপে হাঁটতেন। তাঁর ঘরের সামনে গঙ্গার দিকে বারান্দায় স্বামীজী পায়চারি করতেন। এক রাতে তিনি দেখলেন, স্বামীজী ভাবের ঘোরে গুনগুন করে গাইছেন, ''মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।'' গানের ওই একটি পঙ্‌ক্তিই গাইছেন আর বারান্দায় পায়চারি করছেন। এক-একবার গাইতে গাইতে কেঁদে আকুল, চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। ভোর পর্যন্ত ওই ভাব চলেছিল।[২৬]

আর একদিন রাতে বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর ঘর থেকে করুণস্বরে কান্নার শব্দ পেলেন। ভাবলেন স্বামীজী বোধহয় অসুস্থ। তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে তিনি দেখলেন, স্বামীজী মেঝের ওপর পড়ে কাঁদছেন! বিজ্ঞান মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''স্বামীজী, আপনার কি শরীর খারাপ?'' স্বামীজী চমকে উঠে বললেন, ''কে, পেসন? আমি ভেবেছিলাম তোমরা সব ঘুমিয়ে পড়েছ। দেশের দুঃখদৈন্য, দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে আমি ঘুমোতে পারছি না, মনটা বেদনায় ছটফট করছে। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, এ দেশের সুদিন আসুক, দুর্দিন চলে যাক।'' বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে শোয়ালেন।[২৭]

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর স্মৃতিচারণ : ''পূজনীয় বিজ্ঞান-মহারাজের কাছে শুনেছি, একদিন রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গেছে, বারান্দায় পায়চারি করছেন। বিজ্ঞান-মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'কি স্বামীজী, আপনার ঘুম হচ্ছে না?' স্বামীজী তার উত্তরে বললেন—'দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয় কোনও জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে।' বিজ্ঞান-মহারাজ আমাদের বললেন, 'স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হল আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙে গেল—এটা কি সম্ভব!... কিন্তু আশ্চর্য—পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি, ঠিক সেই সময় ফিজির কাছে কোনও একটি দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে অনেক লোক মারা গেছে। খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, সিসমোগ্রাফের চেয়েও স্বামীজীর Nervous System more responsive to human miseries.' ''[২৮]

বেলুড় মঠে বিভিন্ন নির্মাণকাজ শেষ করে স্বামীজীর আদেশে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে বিজ্ঞান মহারাজ প্রয়াগে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য, সেখানে একটি মঠ স্থাপন। কিন্তু সুযোগ পেলেই তিনি কাশী গিয়ে যখন স্বামীজী কাশীতে, অথবা বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়ে জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাকে দর্শন করতেন। বেলুড় মঠে এলে স্বামীজী মঠে উপস্থিত আছেন কি না তা দূর থেকেই তিনি বুঝতে পারতেন—''স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে থাকতেন তখন মঠটি আমার কাছে জ্যোতির্ময় মনে হত, দূর থেকে বেশ টের পেতুম। তিনি মঠে না থাকলে মঠটি নিষ্প্রভ দেখাত।''[২৯]

স্বামীজীর দেহত্যাগের বহু বছর পরেও এলাহাবাদ থেকে বেলুড় মঠে এলে তিনি স্বামীজীর অস্তিত্ব অনুভব করতেন। ১৯৩৫ সালে বেলুড় মঠে একদিন তিনি সাধুদের বলেন, ''স্বামীজী এখনও এখানে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পা টিপে টিপে যাই, যাতে তাঁর কোনও অসুবিধা না হয়। তাঁর ঘরের দিকে তাকাইনে, পাছে চোখাচোখি দেখা হয়ে যায়।'' শুনে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন, ''আপনি এখনও স্বামীজীকে দেখতে পান?'' মহারাজের উত্তর : ''তিনি রয়েছেন আর দেখতে পাব না? তিনি এই সামনের বারান্দায় বেড়ান, ছাদে পায়চারি করেন, ঘরে গান করেন, আরও কত কি!''[৩০]

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''দেখো,

সে-দিন আমি কার্যগতিকে বেশ রাত করে কলকাতা থেকে ফিরছি, মঠের দক্ষিণ দিকের সদর সবেমাত্র পার হয়েছি; দেখছি, একটা সার্চলাইটের মতো লাইট পড়ছে। প্রথমে ভাবলাম, গঙ্গা দিয়ে বোধহয় স্টিমার আসছে। কিন্তু যতই সামনে এগোচ্ছি, দেখি—লাইট স্টিমারের নয়, স্বামীজীর ঘর থেকে আসছে। পরে ভাবলাম, হ্যাঁ, স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন কিনা, এ আলো তাঁর থেকেই আসছে।"[৩১]

বেলুড় মঠে স্বামীজীর পাশের ঘরে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন বলে তাঁর এরকম অনুভূতি হত, এ-ধারণা ঠিক নয়। বেলুড় মঠ ছাড়াও অন্য জায়গায় তিনি স্বামীজীর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন। যেদিন স্বামীজী মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন, সেদিন এলাহাবাদের ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে গিয়ে বিজ্ঞানানন্দজী দেখেন যে, স্বামীজী ঠাকুরের কোলে বসে আছেন। তিনি ভাবলেন—এ আবার কী! পরদিনই মঠ থেকে টেলিগ্রাম পেলেন, স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন।

ঘটনাস্থল পাটনা। এক ভক্ত-পরিবার গৃহে প্রথমবার কালীপুজোর আয়োজন করেছেন বিজ্ঞানানন্দজীর অনুমতি নিয়ে। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মহারাজ নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। রাতে তিনি ঠাকুরঘরে দেবীমূর্তির সামনে এসে আনন্দ করে সব দেখলেন। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রাতে কোনও কারণেই যেন তাঁকে ডাকাডাকি না করা হয়, একথা বিশেষ করে বলে গেলেন। পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। পরদিন সকালে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন, ''জানো ভায়া, সারা রাত্রি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীদের নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামীজী গান গেয়েছিলেন তাঁর সুললিত কণ্ঠে। মহাপুরুষ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন।" ভক্ত- পরিবার উপলব্ধি করলেন, মহারাজ সারা রাত ধ্যানে মগ্ন থেকে দেবীকে প্রসন্না করে তাঁদের পূজা সার্থক করেছেন।[৩২]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর অক্ষয় কীর্তি। স্বামীজীই তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিচারণ : ''একদিন বিকালে বেড়াতে যাবার সময় স্বামীজী আমায় ডেকে নিলেন। গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুরের যে একটি মন্দির হবে, সেকথা খুব জোরের সঙ্গে বললেন। আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি বল?' আমি বললাম—'আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই হবে।' মন্দিরের কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ-চোখের চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন তিনি মন্দিরটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে মন্দির কোথায় কি রকম হবে সে প্রসঙ্গই চলল। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করে আমায় একটি প্ল্যান করতে বলেছিলেন। খানিক পরে স্বামীজী খুবই গম্ভীরভাবে বললেন, 'এ দেহটা ততদিন থাকবে না; তা আমি উপর থেকে দেখব।' "[৩৩]

১৯৩৫ সালের ১০ মার্চ শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে স্বামীজী পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়।

মন্দিরের ভিত খুঁড়ে শালবল্লা বসাবার পর কিছুদিন জিনিসপত্রের অভাবে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ আরম্ভ করতে দেরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে অক্ষয়তৃতীয়ার দুদিন পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বিনা সংবাদে এলাহাবাদ থেকে বেলুড় মঠে শুভাগমন করেন। মধ্যাহ্ন আহারান্তে বিশ্রামের পর বললেন, ''আগামী পরশুদিন অক্ষয়তৃতীয়া, খুবই ভাল দিন। ওইদিন ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তাই আমি এসেছি।" জনৈক সাধু বললেন, ''জিনিসপত্র সব এখনও জোগাড় হয়নি; কী করে কাজ আরম্ভ হবে?" মহারাজ বললেন, ''সে যাই

হোক, মন্দিরের ঈশানকোণে একটু কংক্রিটের কাজ আরম্ভ করলেই হবে; পরে যখন জিনিসপত্র জোগাড় হবে, তখন ঠিক ঠিক কাজ আরম্ভ করবে।" অক্ষয়তৃতীয়ার দিন একটি পুষ্পপাত্রে ফুল, দূর্বা, বেলপাতা ও চন্দন ইত্যাদি সাজিয়ে আনা হল, এবং কিছু কংক্রিট ও লোহার রডও আনা হয়। সবই মন্দিরের ঈশানকোণে রাখা হল। বেলা নটার সময় মহারাজ সেই স্থানে এলেন এবং নিচে না নেমে ওপরেই একটি চেয়ারে বসলেন। ভিত্তি স্থাপনের জায়গায় প্রথমে গঙ্গাজল ঢেলে দেওয়া হল। পরে মহারাজ ঐ স্থানে কিছু ফুল দেবার উদ্দেশ্যে পুষ্পপাত্র থেকে হাত বাড়িয়ে ফুল নেওয়ার আগেই হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পুষ্পপাত্র থেকে একটি শ্বেতপদ্ম ও একটি বিল্বপত্র ভিত্তি স্থাপনের জায়গায় উড়ে পড়ে। মহারাজ পুষ্পাঞ্জলি ও কিছু কংক্রিট উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে দিলেন।কাজ শেষ হলে মহারাজ বললেন, ''স্বামীজী বলেছিলেন তিনি উপর থেকে দেখবেন। তাই আজ স্বামীজী এই শুভ কাজে হাওয়ারূপে এসে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেলেন।"[৩৪]

এইসময় চার সপ্তাহ মঠে থেকে তিনি এলাহাবাদে ফিরে যান। বৃদ্ধ বয়সে এই পরিশ্রমে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেও স্বামীজীর অর্পিত কাজটি শুরু করে আসতে পেরেছিলেন বলে মনে খুব আনন্দ। ভক্তদের বলেন, ''স্বামিজীর খুব ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের মন্দির হয়। যাঁদের সামনে ঐ কথা হয়েছিল তাঁরা তো একে একে প্রায় সকলেই চলে গেলেন। যা হোক, এতদিন পরে মন্দিরের বনেদ খোঁড়া হল। কনট্রাকটার মার্টিন কোম্পানি বলেছে যে, দু বছরে মন্দির হয়ে যাবে। আমার কিন্তু মনে হয়, তিন বৎসর লাগবে।... এখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা যে, তিনি তিন বৎসর আরও বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে মন্দিরটি দেখে যেতে পারি।"[৩৫]

বাস্তবিকই, তিনি আর মাত্র তিন বছর শরীর ধারণ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৬ জুলাই গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি পুনঃস্থাপিত করেন। ১৯৩৭ সালে জগদ্ধাত্রীপূজার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা হয় এবং সেজন্য তিনি ওইসময় এলাহাবাদ থেকে বেলুড়ে এসেছিলেন। কিন্তু গর্ভমন্দিরের কাজ তখনও শেষ না হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, ''তোমরা বাপু বড় দেরি কর ! যত তাড়াতাড়ি পার প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করে ফেল; আর বেশি দেরি করো না।... স্বামীজী মন্দিরের প্ল্যান করেন; কিন্তু মন্দির হয়নি। রাজা মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ ভিত্তিস্থাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, যত শীঘ্র পার তোমরা কাজ শেষ করে নাও, দেরি কোরো না।"[৩৬]

এই কথার তাৎপর্য সকলেই বুঝতে পারলেন। তাই নাটমন্দির শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা না করে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি, পৌষ সংক্রান্তির দিন গর্ভমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ স্থাপন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে স্থির হল। প্রতিষ্ঠার দুদিন আগে বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদ থেকে মঠে এলেন। তারপর শুভমুহূর্তে 'আত্মারামের কৌটো' নিয়ে তিনি মোটরগাড়িতে উঠলেন। গাড়ি লাল সালুর ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এসে নতুন মন্দিরের সিঁড়ির নিচে দাঁড়ালে মহারাজ নামলেন এবং আত্মারামের কৌটো নিয়ে মন্দিরে ঢুকে বেদিতে স্থাপন করলেন। পুজো, ভোগ, আরতি ইত্যাদি শেষ হয়ে গেলে মহারাজ ঘরে ফিরে বললেন, ''স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী, আপনি ওপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন; আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নতুন মন্দিরে বসেছেন।' তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রমুখ সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন।" কিছুক্ষণ পর তিনি আরও বললেন, ''এবার আমার কাজ

শেষ হল। স্বামীজী আমার ওপর যে-কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে-ভার আমার মাথা থেকে নেমে গেল।"[৩৭]

স্বামীজীর আরও একটি ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামীজীর পেসন। সেটি হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিগুলিকে বিষয় অনুসারে বিভক্ত করে একত্র সংকলন। ২৪ জুন ১৮৯৬ লন্ডন থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী তাঁর এই ইচ্ছা জানিয়েছিলেন : ''তিনি [ম্যাক্সমুলার] তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণদেবের] একখানি জীবনী লিখতে রাজি হয়েছেন। তিনি শ্রীজীর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্মসম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে।... তুমি উক্ত কার্য সমাধা করে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তর্জমা ও classify (শ্রেণীবিভাগ) করে 'প্রফেসর ম্যাক্সমুলার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংলণ্ড' ঠিকানায় পাঠাবে।"

কিন্তু ম্যাক্সমুলারের লেখা বইতে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির কোনও শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান মহারাজ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দি ভাষায় 'পরমহংস-চরিত' প্রকাশ করেন যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচশত নব্বইটি বাণী একশো উনিশটি বিষয়ে বিভক্ত। সম্ভবত স্বামীজীই বিজ্ঞানানন্দজীকে এই বই লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। 'পরমহংস-চরিত' বইটির আগে প্রকাশিত আর কোনও বইতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলির শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি। রামকৃষ্ণ-বাণী সুচারুরূপে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজই পথিকৃৎ।[৩৮]

১৯২০ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী, স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির নির্মাণের কাজে বেলুড় মঠে যান। এলাহাবাদ থেকে যাত্রা করার কিছুদিন আগে থেকেই তিনি স্বামীজীর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। তখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়ে স্বামীজীর কথাই বেশি বলতেন। প্রায় রোজ স্বামীজীর উপদেশ ও তাঁর মহাজীবনের অপূর্ব ঘটনাগুলি আলোচনা করতেন। প্রায়ই তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে গিয়ে সপ্তর্ষির যে-মূর্তিটি আছে তা তন্ময় হয়ে দর্শন করতেন, আর বলতেন—কল্পে কল্পে যে-সকল সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়, তাঁরাই বিশ্বমঙ্গলের একমাত্র নিয়ন্তা। এসময় তিনি একজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীকে দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি তৈলচিত্র আঁকান এবং নিজের শয়নঘরে তা রাখেন। তিনি বলতেন, ''বিশ্বের সর্বত্র স্বামীজী আছেন; কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলেই তাঁর স্থান, তিনি সেখান থেকেই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।"[৩৯]

এইভাবে স্বামীজীর ভাবে বিভোর হয়ে বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদ থেকে বেলুড় মঠের উদ্দেশে রওনা হন এবং মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। সকালে কুলি-রাজমিস্ত্রিদের আসার আগেই নির্মীয়মাণ মন্দিরের সামনে একটি বেঞ্চিতে এসে তিনি বসতেন। শীতকাল, সামনে গঙ্গা। তাঁর গায়ে একটি লাল কম্বল—কাটা গরম কোট, পায়ে কয়েক জোড়া গরম মোজা, মাথায় কানঢাকা টুপি থাকত—আর গলায় মাফলার, পায়ে চটিজুতো। স্থির হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বসে থাকতেন। এত কাজের মধ্যেও প্রশান্ত মূর্তি। তাঁকে দেখে মনে হত যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। অথচ কাজের সামান্য সূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সামান্য অবহেলাও তিনি ধরে ফেলতেন। মজুর-মিস্ত্রিদের বলতেন, ''দেখো বাবারা, ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করো। এ শিবের মন্দির তৈরি করছ; খুব সাবধান, খুব সাবধান।"[৪০] তাঁকে দেখে তখন গীতার কর্মযোগীর কথা মনে হত।

স্বামীজীর কর্মযোগের আদর্শ—''In the midst of intense activity intense calmness", ''কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম, তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে মন-প্রাণ সেই রাঙ্গা পায়"—তাঁর সমগ্র জীবনের

মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। যুগাবতারের পার্ষদ তিনি; যুগাবতারের লীলার সহায়তায় যুগে যুগে তাঁর আগমন। এবারের লীলায় স্বামীজীর নবভাবনার রূপায়ণ করে গেলেন। তাঁর নিজের কথায়—''স্বামীজী আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর ভালবাসা বলে বোঝানো যাবে না। তাঁর আদেশে কিছু কিছু কাজ করে জীবন ধন্য করেছি।''[৪১] সহজ-সরল এই উক্তি বিজ্ঞান মহারাজ ও স্বামীজীর গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে প্রকাশ করে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ এই সঙ্গপ্রসঙ্গ আজও অগণিত ভক্তহৃদয়কে আনন্দধারায় স্নাত করে। এখানেই তাঁদের সম্পর্কের অ-লৌকিকত্ব, অমৃতত্ব। ✠

তথ্যসূত্র

১। সম্পাদক ও সংকলক : সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায়, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ২৯০ [এরপর, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*]

২। দ্রঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ : মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ, ১৩৫৪), পৃঃ ১১ [এরপর, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*]

৩। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে* পৃঃ ৪০

৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), পৃঃ ৫৬০-৬১

৫। তদেব, পৃঃ ৬০০

৬। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে* পৃঃ ৬

৭। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ ২০

৮। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে* পৃঃ ৭

৯। তদেব

১০। সংকলক : স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪), পৃঃ ২৮০ [এরপর, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*]

১১। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে* পৃঃ ২৪৩

১২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৪৩-৪৪

১৩। দ্রঃ সংকলক : স্বামী অপূর্বানন্দ, *সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৯), পৃঃ ১৪৮-৪৯ [এরপর, *সৎপ্রসঙ্গে*]

১৪। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১১৭

১৫। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১২৬

১৬। জ্যোতির্ময় বসু রায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বিজ্ঞানানন্দ* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, ১৩৯৯), পৃঃ ১১৬ [এরপর, *শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ*]

১৭। তদেব, পৃঃ ১২৪

১৮। তদেব, পৃঃ ১২৬

১৯। তদেব

২০। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৫২

২১। তদেব, পৃঃ ১১৬

২২। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ৭

২৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), ভাগ ২, পৃঃ ১০০ [এরপর *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা*]

২৪। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১৫৯

২৫। *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (২য়), পৃঃ ১০১

২৬। দ্রঃ *শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ*, পৃঃ ১২৯

২৭। তদেব, পৃঃ ১২৭

২৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১২৮

২৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১২৭

৩০। তদেব, পৃঃ ১২৮-২৯

৩১। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৫২

৩২। দ্রঃ *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ৯৮

৩৩। দ্রঃ *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১৫৯-৬০

৩৪। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ ৫১-৫২

৩৫। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১৩৮

৩৬। দ্রঃ *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (২য়), পৃঃ ১১২

৩৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৩

৩৮। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ৩১০-১১

৩৯। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ৩০৩

৪০। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৫২

৪১। তদেব